

পাঠ্যসূচিতে তৃতীয় ভাষা অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা কী



সাখাওয়াৎ আনসারী

প্রকাশ: ১৫ জুলাই ২০২৬ | ০৭:২১ | আপডেট: ১৫ জুলাই ২০২৬ | ১০:২৬

| প্রিন্ট সংস্করণ



সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় সেমিনার। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য- ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব’। আমারও সুযোগ হয় সেমিনারে অংশ নেওয়ার। আমি ছিলাম শেষোক্ত প্রবন্ধটির নির্ধারিত আলোচক। আমাকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়, ভেবেছিলাম- বাংলা এবং ইংরেজির বাইরে আরও কোনো ভাষা এ দেশের শিক্ষার্থীদের শেখানো উচিত হবে কিনা, সেটাই হবে সেমিনারের আলোচ্য। কিন্তু অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম ব্যাপারটি ভিন্ন। যেহেতু আমি ছিলাম শেষ প্রবন্ধের আলোচক; ফলে আমার সুযোগ হয় বেশ কয়েকজন প্রবন্ধকার, আলোচক এবং বক্তার বক্তব্য শোনার। আমার বক্তব্য উপস্থাপনের আগেই আমি নিশ্চিত হয়ে যাই, তৃতীয় একটি (অথবা একাধিক)

ভাষা চালু করতে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে অথবা সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ তৃতীয় কোনো ভাষা চালুর ঔচিত্য-অনৌচিত্য সেমিনারের আলোচনা নয়। বরং আলোচ্য হলো কী পদ্ধতিতে তা চালু করা যায়। একে ঘোড়ার আগের গাড়ি জুড়ে দেওয়া ছাড়া আর কী বলা যায়!

বাংলাদেশের বর্তমান সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিতে তৃতীয় যে কোনো ভাষা সংযোজনের আমরা বিরোধী। ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব’ বিষয়টির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এটি তিনটি একাডেমিক ডিসিপ্লিন-সংশ্লিষ্ট: ভাষাবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক। এই তিনের মধ্যে আবার বর্তমান আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনই মূল। যেহেতু প্রশ্নটি তৃতীয় কোনো ভাষা চালু করা-না করা নিয়ে। ভাষাসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার শাস্ত্র হলো ভাষাবিজ্ঞান। এ জন্যই ভাষাবিষয়ক যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভাষাবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া অপরিহার্য। এই বিজ্ঞানভুক্ত বহুবিধ উপশৃঙ্খলার একটি হলো ‘ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষানীতি চর্চা’।

এটির অন্যতম প্রধান আলোচনা হলো, যে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত ভাষা-সম্প্রদায়ের জন্য উপযোগিতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে দণ্ডর, বিচার, ব্যবসা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রের জন্য ভাষা নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিচার। আদৌ যদি কোনো ভাষা নির্বাচনে বিবেচিত হয়ই, তবে তা কোন বা কোন কোন ভাষা বা কোন স্তর থেকে ভুক্তিযোগ্য; তার কোন রূপ কীভাবে শিক্ষণীয়; শিক্ষা কৌশল কী হবে; শিক্ষাদাতা হবেন কী যোগ্যতা-দক্ষতাসম্পন্ন ইত্যাকার বিষয়ের নির্ধারক হলেন ভাষার পরিকল্পনা ও নীতিবিদরা। যদি তারা এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করেন, তবেই সরকারের ওপর দায়িত্ব বর্তায় সেই সুপারিশ বাস্তবায়ন করার।

ভাষাবিজ্ঞানীর মত- সুপারিশ তো দূরের কথা, তাদের সিংহভাগ এ সম্পর্কে অবহিতই নন। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে এ জন্যই।

প্রশ্ন হলো, সরকার কেন আরও একটি ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করতে চায়? সরকার মনে করছে, এ দেশের যারা বিদেশ থেকে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে, তারা যদি এই দেশগুলোর ভাষা রপ্ত করতে সক্ষম হয়, তবে তারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি যৌক্তিক মনে হলেও আসলে তা যে ভুল ধারণাপ্রসূত- এবার সে আলোচনা।

সরকার কি ভাষাকেই জ্ঞান বা দক্ষতা মনে করে? বস্তুত ভাষা নিজে কোনো জ্ঞান বা দক্ষতা নয়। বরং ভাষা হলো জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের হাতিয়ার (ল্যাংগুয়েজ ইজ এ টুল অব অ্যাকুয়ারিং নলেজ অ্যান্ড স্কিলস)। ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

একটি গাছে বছরে ৫০০ আম ধরে, যার প্রতিটি আমের গড় ওজন ৪০০ গ্রাম। জ্ঞান হলো এমন গাছ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করা, যা বছরে আরও বেশি, ধরা যাক ৮০০ আম দেবে, যার গড় ওজন হবে ৫০০ গ্রাম। এখানে জ্ঞান হলো উদ্ভিদবিজ্ঞান, আর এই জ্ঞানার্জনের হাতিয়ার হলো কোনো না কোনো ভাষা- তা বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফরাসি, চীনা, মারাঠি যা-ই হোক না কেন। জ্ঞানের মতো দক্ষতাও অর্জিত হয় ভাষার মাধ্যমে। ফলে তৃতীয় কোনো ভাষা শিখলেই আমরা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবো বা বেশি অর্থোপার্জন করতে সক্ষম হবো, তা পূর্ণ সত্য নয়। বরং এই রূপান্তরের জন্য এ দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ হতে হবে তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির মতো বিষয় জ্ঞানে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রচুর অর্থ এ দেশে আনা সম্ভব যদি আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাঠাতে পারি। আরবি ভাষায় অসাধারণ দক্ষদের পাঠিয়ে যে তা সম্ভব নয়, এই ছোট্ট বিষয় বুঝতে মহাপণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

যে দেশ প্রায় একক বাংলা ভাষার দেশ, সেই দেশের কত শতাংশ মানুষ কাক্ষিত বাংলা বলা ও লেখায় দক্ষ- সে বিচারে গেলাম না। গেলাম না সেই বিচারেও- যুগ যুগ ধরে ইংরেজি চর্চা করেও আমাদের ইংরেজি দক্ষতা কতটুকু। এর ওপর যদি শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় একটি ভাষা পাঠ্য করা হয়, তার ফল যে অশ্বডিম্ব হবে না- কে জোর গলায় বলতে পারে!

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেশের মোট শিক্ষার্থীর কত শতাংশকে তৃতীয় ভাষা শেখানোর আওতায় আনা হবে? ৫ শতাংশ, বড় জোর ১০ শতাংশ? তাহলে বাকি ৯০ শতাংশের কী হবে? ৯০ শতাংশকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে ১০ শতাংশকে সুবিধাভোগী করে দেওয়া কি সচেতন বৈষম্য নয়? শতভাগকে তৃতীয় ভাষায় দক্ষ করে তোলার এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষকই বা রাষ্ট্র কোথায় পাবে?

শেষ করছি একটি ঘটনা দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলার ছলে আয়োজন করা হয় এক দৌড় প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগী ছয়-সাত বছরের হাড্ডিচর্মসার ক্ষুধার্ত ১২ জন শিশু। ২০০ ফুট দূরে একটি ঝুড়িতে রাখা আছে ছয়টি কমলা। প্রথম হলে পাওয়া যাবে তিনটি, দ্বিতীয় হলে দুটি, তৃতীয় হলে একটি। শুরু হলো দৌড়। অবাক কাণ্ড! দেখা গেল সব কয়টি শিশু পরস্পর হাত ধরাধরি করে একই সময়ে পৌঁছাল ঝুড়ির কাছে। ফলে ১২ জনকে সম্মিলিতভাবে দেওয়া হলো ছয়টি কমলা। একেকজন অর্ধেক করে কমলা ভাগ করে খেতে লাগল। মুখে তাদের চিৎকার- ‘উবুন্টু! উবুন্টু!! উবুন্টু!!!’ ‘উবুন্টু’ হলো বান্টু ভাষার শব্দ, যার অর্থ- ‘আমরা কেউই ভালো থাকব না, যদি আমরা সবাই ভালো না থাকি।’ তৃতীয় ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে কি রাষ্ট্র বৈষম্য না সৃষ্টি করার অঙ্গীকার লালন করে?

ড. সাখাওয়াৎ আনসারী: অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়